



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 585 - 594

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্র চিঠিপত্রে নারীভাবনা

রাখী গরাই

গবেষক, বাংলা বিভাগ

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

Email ID: rakhigorain70@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

রবীন্দ্রনাথ,
চিঠিপত্র, নারী,
সমাজিক অবস্থান,
উৎসাহ, উত্তরণ,
দুর্বলতা।

Abstract

Various aspects of Rabindranath Tagore's personal life concerning women are reflected in his letters. He himself stated that letters create a new sense, as it were, for observing and understanding people (as mentioned in *Chhinnapatra*). Therefore, to provide a complete understanding of his views on women, we have included his letters in this discussion. The discussion, in the context of women's social position, includes his opinions on child marriage, the Sati practice, the condition of women in the family, the division of labor between men and women, and comparisons between Western and Indian women. He encouraged women in various creative pursuits, such as writing, studying, publishing their work, and how to write effectively, as well as contributing to the well-being of the family. His letters also address the shortcomings and weaknesses of women in these areas and how they can be overcome. He believed that a change and development in the status of women was necessary, a conviction that deeply motivated him. The foundation of his vision for women was deeply rooted, and he desired that women's progress should come from within themselves. His letters reveal his involvement in women's development initiatives, such as establishing a girls' school alongside the boys' school in Santiniketan, creating a women's department, appointing a woman as the head of the children's education department, and planning to provide all kinds of education to girls at Visva-Bharati.

Discussion

চিঠি বা পত্র হল মানুষের ব্যক্তিগত ভাব-অনুভূতি প্রকাশের জায়গা। সাধারণভাবে মুখের ভাষায় চিঠি লেখা হয়। ক্রমশ চিঠি বা পত্র লিখন সাহিত্যের মধ্যে স্থান পায়, পরবর্তীতে পত্র সাহিত্যের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে পত্রসাহিত্য রূপে। পত্র বা চিঠির মাধ্যমে লেখক বা সাহিত্যিক যে সাহিত্যবোধ ও রসের সঞ্চার ঘটান তাই পত্রসাহিত্য। এগুলি পত্রকাব্য রূপে বা পত্রোপন্যাস রূপে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। আবার সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে পত্রের ব্যবহারও লক্ষ্য করি। প্রাবন্ধিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেছেন—

“ইউরোপীয় সাহিত্যে পত্রসাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে। ভলতেয়ার, কীটস, বাইরণ, লরেন্স, ক্যাথারিন, ম্যানসফিল্ড প্রভৃতির পত্রাবলী ইউরোপীয় সাহিত্যের মধু ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে প্রাক্ রবীন্দ্রযুগে এক মাইকেল মধুসূদন ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন পত্র কেউ রচনা করেন নি। মধুসূদন তাঁর পত্রাবলীতে তাঁর মনের অনেক ভাব-ব্যঞ্জনাই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তবে সেসব পত্র ইংরেজি ভাষায় রচিত। সে হিসেবে রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম সার্থক পত্র লিখিয়ে। তাঁর পত্রসাহিত্যের ভাণ্ডার বহু বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ। আর তার পরিধিও বহু বিস্তৃত।”^১

বাংলায় পত্রকাব্যের প্রথম রচয়িতা মধুসূদন দত্ত। রোমক কবি ওভিদের (Ovid) বীর পত্রাবলীর (Heroic Epistles) এর আদর্শে মধুসূদন তাঁর ‘বীরঙ্গনা’ (১৮৬১) পত্রকাব্যটি রচনা করেছিলেন। তাতে এগারো জন পৌরাণিক নারীর (১১টি পূর্ণাঙ্গ পত্র) স্বাধীন বাক্ প্রকাশ দেখি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই (যেমন ‘বিষবৃক্ষ’, ১৮৮৩) পত্রের ব্যবহার রয়েছে। পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও (যেমন ‘চোখের বালি’, ১৯০৩) পত্রের ব্যবহার দেখা যায়। আবার রবীন্দ্রনাথের ‘স্বীর পত্র’ (১৯১৪) ছোটগল্পটি পত্রের আঙ্গিকেই লেখা। তবে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র তাঁর ব্যক্তি-জীবনের অনেক ঘটনা, তথ্য বা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। সাহিত্য জীবন ও ব্যক্তি-জীবন পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনা সম্ভারের অনেক বিষয়ের আলোচনা তাঁর চিঠিপত্র বা ছিন্নপত্র বা ছিন্নপত্রাবলিতে রয়েছে। তাঁর সাহিত্যে উঠে আসা কোনো বিষয়কে পুরোপুরি জানতে গেলে তাঁর চিঠিপত্রের সাহায্য নিতেই হয়। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়; ধর্মচিন্তা, আধ্যাত্মিকভাবনা, ঈশ্বরভাবনা; সাহিত্যতত্ত্ব ও সমকালীন সাহিত্যিকদের কথা বা সমালোচনা; জমিদারির কথা, নারীর কথা, নিজ সাহিত্য বা শিল্প আলোচনা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রসঙ্গ, দীর্ঘ জীবনপর্বের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, গভীর দর্শন এবং ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র ভাবনা ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করি। আসলে রবীন্দ্র দৃষ্টিতে পত্রের ভূমিকা কি তা তিনি ‘ছিন্নপত্রের’ ১৪১ সংখ্যক (৮ মার্চ ১৮৯৫, শিলাইদহ) পত্রেই জানিয়েছেন—

“পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভকরি, চিঠিপত্র দ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরও একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি ও যে রকম ক’রে প্রকাশ করে লেখার কথাই ঠিক ততখানি করে না। এই কারণে, চিঠিতেমানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চকিবশ ঘন্টা কাছাকাছি আছে, যাদের মধ্যে চিঠি-লেখালেখির অবসর ঘটে নি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ ক’রেই জানে। যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চরিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই। এই চার পৃষ্ঠা চিঠি মনের ঠিক যে রস দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধে কখনোই তা করে পারে না। আমার বোধ হয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটি সুন্দর মোহ আছে-লেফাফাটি চিঠির প্রধান অঙ্গ, ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার।”^২

চিঠিতে মানুষকে দেখবার ও পাবার জন্য নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে— এর মধ্যে যে সত্যটি লুকিয়ে রয়েছে তা হল— এতে দুপক্ষের মতের আদানপ্রদান হয় বলে কোনো বিষয়ে মত প্রতিষ্ঠা করতে দুপক্ষের ভাবনা আমাদের কাছে সহজেই প্রতিভাত হয়। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে (এক্ষেত্রে ১৯ খণ্ডে প্রকাশিত চিঠিপত্রগুলো নিয়েছি) নারীর বিষয়ে কোন কোন দিকগুলি উঠে এসেছে তা দেখানো হবে।

নারী সংক্রান্ত বিষয়গুলির মধ্যে নারীর সামাজিক অবস্থান, সৃষ্টিশীল কাজে নারীকে উৎসাহ প্রদান ও দুর্বলতাকে চিহ্নিতকরণ— এই দুই ভাগের নিরিখে তাঁর পত্রগুলি আলোচনা হবে।

১. নারীর সামাজিক অবস্থান : রবীন্দ্র চিঠিপত্রে নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ে বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে— বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বিধবা সমস্যা, সংসারে মেয়েদের অবস্থা, নারী-পুরুষের কর্মের বিভাজন, পশ্চিম দেশীয় ও এদেশীয় নারীর তুলনা প্রভৃতি দিকগুলি। এইসব বিষয়ে পত্রগুলি থেকে তাঁর মত জানা যাবে। জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতা দেবীকে লেখা ৩ সংখ্যক পত্রে (শান্তিনিকেতন, চৈত্র ১৩১৭, চিঠিপত্র ৪) উমাচরণের বিয়ের জন্য তিন বছরের পাত্রীর কথা জানতে পারি। যাকে তিনশো টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করতে হবে। আসলে ওই সময় দু-তিন মাস বয়স থেকেই কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। একে বাল্যবিবাহ না বলে শিশুবিবাহ বলা যেতে পারে। তবে বাল্যবিবাহ বিদ্রোহী উমাচরণের প্রতি তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করেছেন তিনি। সতীদাহ প্রথার প্রসঙ্গ রয়েছে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ১৭ সংখ্যক পত্রে (৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১/১৯ ভাদ্র ১৩২৮, চিঠিপত্র ১১)। সতীদাহকে তিনি পাপ বলেই জানিয়েছেন এই পত্রে—

“গান্ধী বলেন, পৃথিবীর লোক scienceএর নাম করে অনেক পাপ করচে। কিন্তু ধর্মের নাম করে তার চেয়ে অনেক বেশি পাপ করে। আমাদের দেশে যে untouchability নিয়ে তিনি কিছুদিন লড়েছিলেন সেও ত ধর্মের উপরে টিকে আছে- আরো এমন হাজার হাজার পাপ আছে। সতীদাহও ত ধর্মানুষ্ঠান ছিল। কিন্তু তাই বলে ধর্মটাকে ত কেউ - অন্তত মহাত্মা- বাড়েমূলে উপড়ে ফেলতে পরামর্শ দেন না।”^৩

সতীদাহকে তিনি যে অন্তর থেকে মানতে পারেন নি তার একটি প্রমাণ তাঁর ‘মহামায়া’ (ফাল্গুন ১২৯৯) গল্পে মহামায়ার স্বামীর চিতাঙ্গি থেকে বেঁচে ফেরার তাগিদে মধ্য দিয়েই বোঝা যায়।

নারী ও পুরুষের কর্মের বিভাগ রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথমদিকে যেভাবে দেখিয়েছিলেন তার কথা উঠে এসেছে। মীরা দেবীকে লিখিত পত্রে ৯ সংখ্যক পত্রে (লন্ডন, শরৎ ১৯১২, চিঠিপত্র ৪) তিনি জানাচ্ছেন—

“পৃথিবীতে মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যে কর্মের বিভাগ হয়েছে তার মধ্যে এটাও একটা- পুরুষেরা দেশের কাজ করবে, মেয়েরা ঘরের কাজ করবে; পুরুষেরা বই লিখবে, মেয়েরা চিঠি লিখবে। চিঠি লেখার নৈপুণ্য মেয়েদের কে স্বভাবসিদ্ধ-পুরুষদের ওটা নেই বল্লেই হয়। আমরা কাজের চিঠি লিখতে পারি- অকাজের চিঠিতে আমাদের কলম সরে না।”^৪

প্রবন্ধে নারী ও পুরুষের কর্মের এই বিভাজনটি বারংবার দেখিয়েছেন যে নারী গৃহকাজে ও গৃহকোণেই সুখী। পরবর্তীকালে তিনি এই ভাবনা থেকে সরে আসছেন, সংসারের বাইরে দুরূহ কাজে নারীকেও স্থান করে নিতে হবে কেননা যুগের হাওয়া বদলেছে, তাছাড়া তা অনিবার্য। মাধুরীলতা দেবীকে লেখা ৪ সংখ্যক পত্রে (Cambridge, Feb 1913, চিঠিপত্র ৪) পশ্চিম আমেরিকার মেয়েদের নিজের হাতে ঘরকন্নার কাজ করাকে প্রশংসা করেছেন। আসলে সেখানে চাকর দাসী পাওয়া যায় না বলে নিজের কাজ নিজেই করতে হয়। তবে আমেরিকার নারীদের সহজেই খুন করার প্রবণতাকে তিনি নিন্দা করেছেন ‘আমেরিকানের রক্তপিপাসা’ (ফাল্গুন ১২৯৮) নামে ‘সাময়িক সারসংগ্রহে’।

রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কিত ভাবনা ব্যক্তি থেকে সমষ্টির দিকে যখনই গেছে তাতে দেখা গেছে সামান্যিকরণের মধ্য দিয়ে ভাবটির প্রতিষ্ঠা দেওয়া, কিন্তু একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ‘ব্যক্তিত্ব’কে প্রধান করে তুলেছেন। একসময় তিনি বলবেন নারী (সমষ্টির ক্ষেত্রে) গৃহকোণেই সুখী, আবার নারীর (ব্যক্তির প্রসঙ্গে) কাছেই এই গৃহকোণ কখনো কারাগার হয়ে ওঠে। মীরা দেবীকে লেখা ৩৪ সংখ্যক (লন্ডন, জুন ১৯২০, চিঠিপত্র ৪) চিঠিতে বলেছেন—

“বোলপুরের আকাশ আলোক মাঠ সেখানকার স্বাধীনতা তোর পক্ষে কতখানি সেত আমি জানি। কিন্তু জগতে যত জীবজন্তু আছে সবচেয়ে পরাধীন মানুষ। কেননা মানুষ স্বাধীনতার মূল্য জানে অথচ পদে পদে তার থেকে বঞ্চিত। বিশেষত মেয়েদের কথা যখন ভাবি তখন মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমরা

পুরুষ, কত যুগ থেকে মেয়েদের জেলখানার দারোগাগিরি করে আসচি- এর নিষ্ঠুরতা যে কতদূর যেতে পারে তা কল্পনা করবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়েছি। ... এই কষ্টের মূলে আছে দুই দলের সংঘর্ষ, একদল জবরদস্তি করে নিজেরই ইচ্ছা কে বলবান করে তুলতে চাচ্ছে, আর একদল সেই চাপে পিস্ট হচ্ছে। একদলের হাতে অস্ত্র আছে আর একদল নিরুপায় কিন্তু এই নিরুপায়ের দল জগতে জিৎবে; যারা চিরদিন কেবল জবরদস্তি করতে অভ্যস্ত তারা নিজের অস্ত্রের চাপে ভেঙ্গে পড়বে।”^৫

নারী যেখানেই কষ্ট পেয়েছে লাঞ্ছনা ভোগ করেছে সেখানেই গর্জে উঠেছে তাঁর লেখনী। ইউরোপের নারী-পুরুষের স্বাধীন জীবনযাপনের কথা, উভয়ের অর্থউপার্জন ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করার কথা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি থেকে জানতে পারি, ১১৬ সংখ্যক পত্রে (২১ এপ্রিল ১৯৩৩, চিঠিপত্র ১২) বলছেন—

“যুরোপে আর্থিক নীতি অনেক দিন থেকেই বিশেষ পন্থায় চলছিল। সেখানে ধনসৃষ্টি ও ধনভোগে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ছিল প্রবল। তার প্রথম আঘাত লেগেচে গার্হস্থ্যে। গৃহযাত্রায় স্বভাবতই স্ত্রীপুরুষের অধিকার ভাগ আছে। পুরুষের কর্তব্য ধন আরোহণ, মেয়ের কর্তব্য সংসারের প্রয়োজনে তার ব্যয়ের ব্যবস্থা। মেয়েকে আর্থিক দিকে পুরুষের অধীন থাকতেই হয়। সেই অধীনতায় পুরুষের ইচ্ছা ও আদর্শের সঙ্গে নিজেকে নম্রভাবে না মেলাতে পারলে সে বাঁচেই না। কিছুকাল থেকে যুরোপে জীবনযাত্রার আদর্শ বহুব্যয়সাধ্য হওয়াতে পুরুষেরা অনেকেই স্ত্রীর দায়িত্ব স্বীকার করতে কণ্ঠিত। সেখানে ঘর ভেঙে বাসার বিস্তার বেড়ে চলেছে। মেয়েরা তাদের চিরকালের আশ্রয়চ্যুত হয়ে স্বয়ং জীবিকা উপার্জনে বাধ্য হয়েছে। ... পাশ্চাত্য মহাদেশে এই অর্থোপার্জনরীতির বিপর্যয় ঘটাতেই ক্রমশই স্ত্রীধর্মনীতির পরিবর্তন স্বতই ঘটে আসছে। এর প্রভাব পুরুষের উপর পড়তেও বাধ্য। তারা অনেকে গার্হস্থ্যের দায়িত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত, অপর পক্ষে বহুসংখ্যক মেয়েও তাই। এরা উভয়েই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায় অতএব এদের বিবাহ ঠিক কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই নিয়ে সে দেশে আন্দোলনের সীমা নেই।”^৬

এখানে স্পষ্ট দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিচ্ছেন। কেননা প্রয়োজনের বা আবশ্যিকের বিচারে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। ‘যুরোপ যাত্রীর ডায়ারি’তে এই কথায় বলেছেন। আসলে তিনি সমাজ নিয়মে চলতে থাকা যেকোনো বিষয় সম্বন্ধেই (যেমন বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, অবরোধপ্রথা ইত্যাদি বিষয়ে যা আবশ্যিকের নিয়মে পরিবর্তিত হবে) এই ধরনের কথা বলেছেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিয়মে পরিবর্তন আসবে তা সাদরে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ‘নারীর মনুষ্যত্ব’ (১৯২৮) প্রবন্ধে বলেছিলেন—

“স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে সেটা অস্বীকার করা ভুল। একথা আজ সকলেই জানে আমাদের দেহে কতকগুলি gland আছে তার রস আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে কেবল যে শরীর প্রকৃতিকেই বিশিষ্টতা দেয় তা নয়, আমাদের মানস প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ গুণকে বিশেষভাবে পুষ্টি দিয়ে থাকে। ... অস্থিতে চর্মেতে বিশেষত্ব যে কারণে ঘটায় সেই কারণেই বিশেষত্ব ঘটায় চিত্তে।”^৭

এই কথার প্রেক্ষিতেই বোঝা যায় তিনি প্রাকৃতিক ভাবেই নারী-পুরুষের আন্তরিক ও ব্যবহারিক বিশিষ্টতাকে একটি মনস্তত্ত্বের ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। সাধারণত এই বিশিষ্টতা সমাজের নিয়মে আরো পোক্ত হয়েছে আমাদের দেশে। ফলে নারীর মধ্যে বিশেষভাবে দয়া, মায়া, স্নেহ ইত্যাদি কোমল গুণগুলির প্রকাশ ঘটেছে আর পুরুষের মধ্যে বহির্জগতের সঙ্গে লড়তে অপেক্ষাকৃত কঠোর চিন্তাবৃত্তির জন্ম। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের নারী-পুরুষ সম্পর্কের ভাবনা, পূর্ণতার ভাবনা, অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ৬৩ সংখ্যক পত্রে (৩ ডিসেম্বর ১৯৩১, চিঠিপত্র ৯) এই ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করি—

“মেয়েরা অজস্র স্নেহ প্রেম ভক্তি দিয়ে নিজেকে এবং নিজের সংসারকে পূর্ণ করে তুলবে এইটেই চাই, এইটে হলো তার রসের দিক, এর সঙ্গে তার শক্তির দিক আছে যে দিকে তার নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ত্যাগের দৃঢ়তা, যে-শক্তির দ্বারা সে আপন আশ্রয়কেও আশ্রয় দেয়, পালন করে, প্রতিষ্ঠিত রাখে, তার বিকারকে শোধন করে তার বেদনার আরোগ্য আনে, অর্থাৎ যাতে-করে সে নির্ভরের দ্বারা দুর্বল করে না চরিতার্থ করে। কিন্তু ওই রসের ধর্ম যদি পুরুষও আশ্রয় করে তাহলে নিজের উপরে পুরুষকে নারীভাব আরোপ করতে হয়, অর্থাৎ সেটা হয় তার স্বভাবের বিরুদ্ধ। পুরুষ নিজেরই স্বভাবকে দ্রুষ্টি করে তবে সার্থকতা লাভ করে ... বুদ্ধি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে বীর্য্য দিয়ে অপ্রতিহত অধ্যাবসায় দিয়ে আমাদের সৃষ্টিকে কেবলি উৎকর্ষের দিকে নিয়ে চলব, সমস্ত বাধাকে পরাস্ত করব, প্রতিকূলতাকে ভাগ্যের অমোঘ লিখন বলে স্বীকার করে নেব না, এই হলেই সত্যকার পুরুষের দ্বারা সংসারে স্বাস্থ্য শান্তি সম্পদ আত্মসম্মান বজায় থাকতে পারে, এই হলেই মেয়েরাও নিরাপদ নির্ভর ও গৌরব লাভ করে।”^৮

রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই মানুষের হিতসাধন তাঁর চরম কাম্য। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে তাঁর নারীভাবনায় এসেছে স্ববিরোধিতা কিন্তু এর গভীরে গেলে দেখা যাবে নারীকে তিনি এমন জায়গায় দেখতে চেয়েছেন যেখানে নারী ঘরকেও বাঁধবে আবার বিশ্বের মেয়ের মতো সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়েও যাবে, নিজের অধিকারের সঙ্গে পুরুষের মতো বুদ্ধিবৃত্তির বলে দুরূহ কর্মে অংশ গ্রহণ করবে। আসলে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের সেরা গুণগুলির মিলিত রূপেই নারীপ্রতিমূর্তি গড়তে চেয়েছিলেন। একটি পরিবার, একটি সমাজ, একটি সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা অপরিসীম। তবে সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে গেলে পরিবারকেও বাঁচাতে হবে, যার ক্ষয় লক্ষ করেছিলেন পশ্চিমের দেশগুলিতে। অতি স্বার্থাঙ্ক ও অতি স্বাতন্ত্র্যভাবের ফলে সেখানকার পরিবার প্রায় ভাঙতে শুরু করেছে। আর অন্যদিকে আমাদের দেশে নারীর অতি অন্ধবিশ্বাস, হৃদয়ালুতা ও পুরুষের কাপুরুষতার ফলে অত্যাচার-নীচতা-শোষণে সমাজ পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। দুটোই সভ্যতা টিকিয়ে রাখার পরিপন্থী হিসেবে দেখিয়েছেন তিনি। তাই সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার নিমিত্তেই মানবতার, ‘পরিপূর্ণ মানুষের’ জয়গান করেছেন। সেই পরিপূর্ণ মানুষ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে।

২. সৃষ্টিশীল কাজে নারীকে উৎসাহ প্রদান ও দুর্বলতাকে চিহ্নিতকরণ : রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নারীকে কীভাবে দেখিয়েছেন তার একটি ধারণা পেয়েছি, কিন্তু তিনি নারীকে বাস্তবে কীভাবে দেখেছেন তার কিছুটা আভাস তাঁর চিঠিপত্রে দেখতে পাব। সবচেয়ে বড়ো কথা হল তিনি নারীকে প্রভূত সম্মান করতেন এবং সম্মানের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন। তিনি মূলত নারীদেরকে যে পত্রগুলো লিখেছেন সেখানে নারীদের বিভিন্ন ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন, যেমন মেয়েদের লেখালেখি নিয়ে, পড়াশোনার বিষয়ে, লেখা ছাপানো বিষয়ে, কীভাবে লিখতে হবে, সংসার গড়া বা সংসারের মঙ্গল করা বিষয়ে সর্বোপরি এইসব ব্যাপারে নারীদের কি কি খামতি বা দুর্বলতা আছে এবং সেগুলি কীভাবে দূর করা যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁর চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে। নির্ঝরিনী সরকারকে লেখা পত্রে (১৮ সংখ্যক, ১১ আগস্ট ১৯১১, চিঠিপত্র ৭) নারীদের কবিত্বশক্তি নিয়ে বলেছেন তিনি। তবে এটি আমাদের দেশের মেয়েদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন—

“আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কবিত্বশক্তি থাকিলেও তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। তাঁহারা অন্তঃপুরে যে পারিবারিক গণ্ডিটুকুর মধ্যে বন্ধ থাকেন সেখানে জীবনের অভিজ্ঞতা সংকীর্ণ এবং সেখানে কল্পনাবৃত্তি প্রসারতা লাভ করিতে পারেনা। তাহা ছাড়া নানা উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যরচনার সহিত পরিচয়ের দ্বারা চিত্তবৃত্তির যে স্ফূর্তি ঘটে আমাদের মেয়েদের সে সুযোগও অতি অল্প। এই জন্য আমাদের লেখিকাদের কবিতা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দুর্বলভাবে ভাবে বিচরণ করে— তাহার মধ্যে সরলতা ও কোমলতা থাকে কিন্তু যথেষ্ট শক্তি থাকেনা। এইজন্য কবিতা কোনোমতেই নিত্যস্থান লাভ করে না।”^৯

নির্ঝরিনী সরকারের মা সরলাবালা সরকারের লেখা ‘প্রবাহ’ বইয়ের কবিতাগুলি পড়ে তার স্নিগ্ধতার প্রশংসা করে উক্ত কথাগুলি জানান। আবার কাদম্বিনী দত্তকে লেখা ২০ সংখ্যক (১১ জুন ১৯১১, চিঠিপত্র ৭) পত্রে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার,

সংসারের মঙ্গল কামনার মন্ত্রটি দিচ্ছেন। কেননা একজন নারী হিসেবে তার জীবনে এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসে জগতের মঙ্গলের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ দিয়েছেন তাঁকে এই বলে—

“তুমি কেবলমাত্র একটি অন্তঃপুরের গৃহকর্মরতা অখ্যাত রমণী নহ, তুমি বিশ্বের মানুষ, তুমি ঈশ্বরের আপন।”^{১০}

নারীর অবস্থানের বদল ও বিকাশ দরকার, এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে ভেতর থেকে তাড়িত করেছে। তাই তাঁর নারীনির্মাণের ভিত্তি অনেক গভীরে প্রোথিত এবং নারীর উত্তরণ ভেতর থেকে হোক— এটাই তিনি চেয়েছিলেন। কাদম্বিনী দেবীর মধ্যে ভাববার ও ভাবপ্রকাশের শক্তি সাধারণের থেকে অনেকটাই বেশি তা লক্ষ করেছিলেন এবং তাঁকে (কাদম্বিনীকে) এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছিলেন (৮৯ সংখ্যক পত্রে বলেছেন)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেয়েদের সঙ্গে পুত্রবধু প্রতিমা দেবীর শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ বা তত্ত্বাবধান করেছিলেন। প্রতিমা দেবীকে পড়াশোনা ও অন্যান্য বিষয় শেখানোর ক্ষেত্রে যত্নবান ছিলেন। প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠিপত্রে তার পরিচয় পাই। আবার পুত্র রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি থেকে প্রতিমা দেবীর প্রতি তাঁর যত্নশীল মনটিকে সজাগ থাকতে দেখি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা ৭ সংখ্যক (২মে ১৯১০/১৯ বৈশাখ ১৩১৭, চিঠিপত্র ২) পত্রে তিনি বলছেন—

“কিন্তু একটি কথা মনে রাখতেই হবে। তুই লেখাপড়া শেখা সমাধা করে জীবনপথের পাথেয় সংগ্রহ করে প্রস্তুত হয়ে সংসারে প্রবেশ করেছিস কিন্তু বৌমার তা হয় নি— এখনো সে ছেলেমানুষ— জগতের সমক্ষে এবং নিজের সম্বন্ধে তার জ্ঞানের বিকাশ হয় নি। এই জায়গায় তোর সঙ্গে সে ঠিক সমকক্ষতায় এসে দাঁড়ায় নি। কাজেই, তার চিন্তকে জাগিয়ে তোলা ভার তোকে নিতে হবে— তার জীবনের বিচিত্র খাদ্য তোকে জাগাতে জোগাতে হবে— তার মধ্যে যে সকল শক্তি আছে তার কোনোটা মুষড়ে না যায় সে দায়িত্ব তোর। এইখানে সে তোর শিষ্য, তুই তার গুরু। তাকে মানুষ হিসেবে সমগ্রভাবে তোকে দেখতে হবে— কেবল গৃহিণী এবং ভোগের সঙ্গিনীভাবে নয়। ওর মধ্যে যে বিশেষ শক্তি আছে তার কোনোটা যদি অন্যদের নষ্ট হয় তাহলে ওর সমস্ত প্রকৃতিতে তার আঘাত লাগবে— এই কথা স্মরণ করে কেবলমাত্র নিজের রুচি, ইচ্ছা ও প্রয়োজনের দিক থেকে প্রতিমাকে দেখলে হবে না— ওর নিজের দিক থেকে সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে, এই ভার তোরই উপর।”^{১১}

প্রতিমা দেবীকে গড়ে তোলার সদৃশ্যে তাঁর নারীভাবনার ক্ষেত্রকে আরো পরিপূষ্টি দান করে থাকবে তা মনে করাই যায়। বৌমা প্রতিমার পড়াশোনায় কোনোপ্রকার 'disturbance' না হয় সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখার কথা রবীন্দ্রনাথকে ৯ সংখ্যক চিঠিতে (১০ সেপ্টেম্বর ১৯১০/ ২৫ ভাদ্র ১৩১৭, চিঠিপত্র ২) তিনি জানিয়েছেন। কখনও রবীন্দ্রনাথ নিজে ভার নিয়েছিলেন প্রতিমার দেবীর পড়াশোনার ব্যাপারে। কখনও ভার পড়েছে আশ্রম-শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তী বা শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর কাছে। আবার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথই জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফত মার্কিন মহিলা মিস বুর্ডেকে নিযুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত হন। ‘প্রবাসী’ ও ‘কবিতা’ পত্রিকায় ‘কল্পিতা দেবী’ ছদ্মনামে প্রতিমা দেবীর অনেক গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ বার হয়। এমনকি শান্তিনিকেতনের নানা নাটকের অভিনয়, অভিনয়ের রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, নৃত্যকলা প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিমা দেবীর অনুরাগ ও দক্ষতা জন্মেছিল, অবশ্যই তাতে ছিল রবীন্দ্র সান্নিধ্য। সবচেয়ে বড় কথা রবীন্দ্র শিল্প-সৃষ্টির নৃত্যের দিকটিতে প্রতিমা দেবী সার্বভৌম ভূমিকা নিয়েছিলেন। আসলে তখন ঠাকুরবাড়ির অধিকাংশ মহিলারা শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে-শিল্পে নিজেদের নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন। পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা, লেখালেখি, চিত্রকলা-সঙ্গীতকলা-নৃত্যকলা-অভিনয়ে দক্ষতা, বিভিন্ন হস্তশিল্পে নিযুক্ত থাকা, শিশু-বালিকা-মহিলাদের শিক্ষা ও সার্বিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতি করা বা আশ্রম তৈরি ইত্যাদি গঠনাত্মক বা উন্নয়নমূলক কাজে ঠাকুরবাড়ির মহিলারা এগিয়ে গিয়ে আধুনিক রুচি ও মননের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রতিমা দেবীও এই পরিবারেরই একজন স্বনামধন্যা। তাঁকে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল মনোভাবেরই

পরিচয়। প্রতিমা দেবীকে লেখা ২, ৩, ৬ ও ৭ (চিঠিপত্র ৩) সংখ্যক পত্রে প্রতিমা দেবীর বাংলা ও ইংরেজি শেখার বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ প্রকাশ দেখতে পাই। ঠাকুরপো (প্রতিমার ঠাকুরপো), হেমলতা দেবী ও মিস বুর্ডেটের কাছে শিখে নেওয়ার কথা বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। ১১ ও ১২ সংখ্যক চিঠিতে প্রতিমার রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) শোনার ও বিজ্ঞান (Science) পড়ার কথা জানা যায়। আবার রবীন্দ্রনাথও অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ দিয়েছেন প্রতিমাকে। তিনি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিমার লেখালেখির পরিমার্জন করে দিতেন। ১১১ সংখ্যক পত্রে (চিঠিপত্র ৩) তার উল্লেখ রয়েছে—

“তোমার লেখাটা মেজে ঘষে দিয়েছি— তার শেষ অংশটা বদলেছি কিছু মনে করো না। আমার তো মনে হয় সব সুন্দর সুখ পাঠ্য হয়েছে— পুজোর বাজারে অনায়াসে চলবে। তোমার বড় মা সন্ধান পেলে লুফে নেবেন। কিন্তু এটা প্রবাসীর যোগ্য। হাত বদল করতে চাও যদি পরিচয়ে চেষ্টা দেখতে পারো।”^{২২}

শুধুমাত্র প্রতিমা দেবীর লেখা নয়, অনেকের লেখা তিনি পরিমার্জন করে দিতেন। এর পেছনে অবশ্যই রয়েছে উৎসাহ প্রদান। ইন্দিরা দেবীর তরজমা ও কবিতার উৎকৃষ্টতার বিষয়ে মত দিয়েছেন ইন্দিরা দেবীকে লেখা ২৮ সংখ্যক (চিঠিপত্র ৫) পত্রে—

“বব, তোর সব তর্জমাগুলিই খুব ভালো হয়েছে। আর ভাঙা প্রতিমার উপর যে কবিতা লিখেছিস সেও সুন্দর। কবিতার তর্জমাগুলি বিশ্বভারতীর জার্নালের জন্যে সুরেনকে কপি করে পাঠাবার জন্যে অমিয়কে বলে দিলাম। তুই যদি আর কোথাও প্রকাশ করতে চাস তাও করতে পারিস। ... এইমাত্র তোর তর্জমাগুলি অপূর্বকৈ দেখালুম— সে বললে আমার কবিতার এত ভালো তর্জমা সে আগে আর দেখে নি।”^{২৩}

একজনের হয়ে ওঠার পেছনে কিছু মানুষের হাত থাকে, রবীন্দ্রনাথের এই সংবেদনশীল মনটা ছিল। অন্তত তাঁর পাশে থাকা এমন অনেক নারীই ছিলেন যাঁরা এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্র সান্নিধ্য ও উৎসাহ পেয়েছিলেন। বিচিত্র কর্মেরত রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সেই সময় ও সুযোগটি দিয়েছিলেন। ইন্দিরাকে লেখা ৬২ সংখ্যক পত্রে (চিঠিপত্র ৫) লিখেছেন—

“তোমার অন্তঃশীলার বিচার লেখাটি পড়ে খুব ভালো লাগল। ইংরেজি ভাষায় এই রকম লেখাকেই বলে সমুজ্জ্বল। এই সংখ্যার চিত্রালিতেই কোনো তত্ত্বজ্ঞানী কোনো নভেলের যে সমালোচনা করেছেন, সেই লেখার আবিলতার সঙ্গে তোর রচনার দীপ্তির তুলনা করলে সেই পন্ডিতের প্রতি কৃপা জেগে ওঠে মনে।”^{২৪}

আবার রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকালে স্বর্ণকুমারী দেবীও লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিছু লেখার সমালোচনা করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখার মধ্যে তিনি কিছু খামতি বা অভাবের দিকও অনেক সময় তুলে ধরেছিলেন, যেমন ইন্দিরাকে লেখা ১ সংখ্যক (৬ই মে ১৯১৩, চিঠিপত্র ৫) পত্রে রয়েছে—

“নদিদি আমাকে তাঁর ‘ফুলের মালা’র তর্জমাটা পাঠিয়ে-ছিলেন। এখনকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন এ সব জিনিষ এখানে কেন কোনোমতেই চলতে পারে না। এরা যাকে reality বলে সে জিনিষটা থাকা চাই। এ জিনিষের সঙ্গে আমাদের করবার অত্যন্ত কম— সেই জন্যে এটা আমরা চিনিও নে এবং এর অভাবটা কি তা আমরা বুঝিও নে।”^{২৫}

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা (চিঠিপত্র ১২) অনেক পত্রেই ৬, ১৪, ১৬, ২৪ সংখ্যক পত্রে মাধুরীলতা, মীরা, বড়দিদি ও হেমলতা দেবীর লেখা ‘প্রবাসী’তে পাঠানোর কথা জানিয়েছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে। এইভাবে সেসময়ের নারীর লেখাকে সর্বজন সমক্ষে নিয়ে আসার ভূমিকাও পালন করতেন রবীন্দ্রনাথ। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা অনেক চিঠিতে

দেখব তিনি হেমন্তবালার লেখার প্রশংসা করেছেন এবং কীভাবে লেখাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তার নির্দেশও দিয়েছেন। ৩ সংখ্যক (৪ বৈশাখ ১৩৩৮, চিঠিপত্র ৯) চিঠিতে রয়েছে—

“তোমার চিঠিতে তোমার কবিতার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। অত্যন্ত খাঁটি কবিতা, বানানো নয়, পরিণত লেখনীর সৃষ্টি। তুমি বাংলাদেশে অনেককে আবিষ্কার করেচ লিখেচ— বোধ হয় নিজেকেও আবিষ্কার করেচ কিন্তু প্রকাশ করেচ কি না জানি নে।”^{১৬}

আবার সৃষ্টি করতে গেলে বিশুদ্ধ বা বীর্যবান ও জ্ঞানী হতে হয় তার কথা ৪ সংখ্যক চিঠিতে রয়েছে। লেখার ক্ষেত্রে দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। হেমন্তবালার সাহিত্য রচনার দুর্বল অংশকে চিহ্নিত করেছেন ১১ সংখ্যক (১৩ মে ১৯৩১/৩০ বৈশাখ ১৩৩৮, চিঠিপত্র ৯) চিঠিতে—

“অথচ এ কথা নিশ্চয় জেনো, সাহিত্যের দিক থেকে তোমার লেখায় বারে বারে আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত করেছে। কিন্তু সাহিত্য বিচার বুদ্ধিতে তুমি যে প্রশস্ত আদর্শ পেয়েছ তা আমি মনে করি নে। না পাবার প্রধান কারণ বাংলা সাহিত্যকে তুমি বাংলা সাহিত্যের বাহির থেকে দেখতে পাও নি। যুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের যে প্রকাশ আছে ঘটনাক্রমে তার পরিচয় তোমার কাছে নেই।”^{১৭}

১৬ সংখ্যক পত্রেও তিনি এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া ১৭ ও ৩১ সংখ্যক চিঠিতে তাঁর (হেমন্তবালার) লেখায় বাঙালি মেয়ের অন্তরের সুর, চিত্তশক্তির প্রসারতা, স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তির উদারতা ও সাধনার প্রকাশকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ৩৫ সংখ্যক (২১ অগস্ট ১৯৩১/৪ ভাদ্র ১৩৩৮) চিঠিতে সৃষ্টিশীলতার গুণকে দেখিয়েছেন—

“তোমার মন সৃষ্টিপ্রবণ, তাই আত্মসৃষ্টি কার্যে তোমার চিন্তার বিরাম নেই— অচল সংস্কারের মধ্যে চিরদিনের মতো নিশ্চিত্তে থাকা তোমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। চিন্তার দ্বন্দ্ব তোমার মন তাপিত। ... তোমার মধ্যে চিন্তার এই সচলতা সাধারণ স্ত্রীজনসুলভ নয় এই জন্যেই নারীস্বভাবের রীতি-নিষ্ঠতার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধচে।”^{১৮}

এখান থেকেই অনুমিত তিনি নারীপ্রগতির গোড়াটাকে কিভাবে মজবুত করতে চেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ প্রদত্ত কিছু বিষয় নারীকে কীভাবে আচ্ছন্ন করে রেখে বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ৬০ সংখ্যক (নভেম্বর ১৯৩১) পত্র থেকে জানা যায়—

“তুমি স্ত্রীলোক, নানা শিক্ষাদীক্ষা অভ্যাস সংস্কারে তোমাকে ঘিরেছে - তাই কষ্ট পাচ্ছ - অথচ তোমার আর কোনো গতি নেই। নূতন যে কোনো পথ খুঁজতে যাবে, খুঁজে পাবে না কষ্ট পাবে। যদি অবস্থা অনুকূল হোত, যদি যথেষ্ট শিক্ষা ও চর্চা থাকত তাহলে তুমি রচনার আত্ম-প্রকাশে পূর্ণতা পেতে- সুযোগ হয় নি— এ দুঃখ কে মেটাবে?”^{১৯}

এর জন্য কতকটা নারী নিজে এবং সমাজও দায়ী। ৯৯ সংখ্যক (১৩ অক্টোবর ১৯৩২/২৭ আশ্বিন ১৩৩৯) পত্রে নারীর সংকীর্ণ জীবনক্ষেত্রকে প্রগতির অন্তরায় হিসেবে স্বীকার করেছেন তিনি—

“আমাদের দেশে মেয়েদের জীবনক্ষেত্র বেড়া দিয়ে খাটো করা, তার মধ্যে মানুষের চিত্ত সব খোরাক পায় না, উপবাসী থাকে। ... তোমার এই সঙ্কীর্ণ অবস্থায় থেকেও তুমি মুক্তির আশ্বাদ পেতে পারতে যথেষ্ট পড়াশোনায়, এবং রচনার মধ্যে। বহির্জগতের স্বাধীনতা, যা তোমার নিজের ছেলের আছে, তা তোমার নেই, মানুষের এই মস্ত অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত। কাজেই অন্তর্জগতের মধ্যে সঞ্চরণের স্থান প্রশস্ত করা ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই।”^{২০}

কিন্তু হেমন্তবালার প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যে তাঁর পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি, তার কারণ একাধিক চিঠি থেকে জানতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার সে কথা চিঠিতে জানিয়েছেন। ১৪৪ সংখ্যক (১২ জুলাই ১৯৩৪/২৭ শ্রাবণ ১৩৪১) চিঠি থেকে জানা যায়—

“সুসংলগ্ন করে বিস্তারিত করে লেখবার সাধনা যদি তোমার পাকা হতো তাহলে সাহিত্যে তুমি কৃতিত্ব লাভকরতে পারতে। বিশেষত মেয়েরা বাংলা ভাষায় যে সব লেখা আজকাল লেখে তা এমনি দুর্বল, বানানো, নকল করা জিনিষ যে তোমার লেখবার স্বাভাবিক শক্তি ও সাহস দেখে দুঃখ হয় তুমি সাহিত্যে প্রবেশ করতে পারো নি। প্রবেশ করলে তোমার প্রতিভার সাহসিকতা দেখে অনেকেই তোমাকে অজস্র গাল দিত; কিন্তু অযোগ্য নিন্দুকদের গালের দ্বারাই তোমার যথার্থ বিচার হতো।”^{২১}

ঠিক এই দুঃখই তিনি প্রকাশ করেছেন ১৪৯ সংখ্যক (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪) চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের সেই বাধাগুলিকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, ফলে অপারঙ্গমতার বিন্দুগুলিও তাঁর চোখে দৃষ্টিগোচর হয় নি—

“তোমার মধ্যে একটা স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক উৎসাহ আছে— তুমি সব জিনিসকে স্পষ্ট দেখতে চাও— তোমার নিজেকেও তুমি খুব স্পষ্ট করে দেখে থাকো, তুমি আপনার কাছে আপনাকে ভোলাও না। এইখানেই তোমার প্রকৃতিগত আধুনিকতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অদৃষ্টক্রমে তুমি মেয়ে হয়ে জন্মেছ— শুধু যে কেবল সামাজিক আবরণ তোমাকে বেষ্টন করে রেখেছে তা নয়, আজন্মকাল শিক্ষার অভাবও কঠিন জেনে না, তার দেয়ালে ফাঁক অল্পই।”^{২২}

এই যে নারী হয়ে জন্মানো এবং তার উত্তরণের পথে সমাজগ্ৰস্ত বাধাকে তিনি বহু জায়গায় তুলে ধরেছেন। তেমনই মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা আজন্মকাল থেকে তাদের মধ্যে চলে আসা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা। বাইরের জগতের সঙ্গে লড়াই করে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে এগুলিকে মূল থেকে উৎপাটিত করতে হবে, এই বিষয়টিকে তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে বারংবার উল্লেখ করেছেন। ১৯৪ সংখ্যক (৮ জানুয়ারি, ১৯৩৬, চিঠিপত্র ৯) চিঠিতে বলেছেন—

“তোমার অভ্যস্ত সংস্কার এবং তোমার বুদ্ধির মধ্যে কিছুতেই মিল হচ্ছে না। মেয়েরা স্বভাবতই বিচারবুদ্ধির চেয়ে প্রথার প্রতি অন্ধভাবে আসক্ত। আমাদের দেশে বারো আনা পুরুষ স্ত্রীস্বভাবাপন্ন-ভীরুতা এবং মূঢ়তায় আকর্ষণ নিমজ্জিত। কিন্তু ধাক্কা লেগেচে। জাগতেই হবে।”^{২৩}

আসলে এই জাগার ব্যাপারটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। এই ধাক্কা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন এবং ভারতবর্ষীয় জীর্ণ পুরুষতন্ত্রেও লেগেছে। পুরুষদের নিজেদেরকে সংশোধন করা যা নারীর ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে নতুন যুগে। ‘নারীর মনুষ্যত্ব’ (১৯২৮) ও ‘নারী’ (১৯৩৬) প্রবন্ধে এই কথায় বলেছেন তিনি।

Reference:

১. বসু, দক্ষিণারঞ্জন (সম্পা.), রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃ. ২০১
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কার্তিক ১৩৬২, পৃ. ২৭২
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৩৮১, পৃ. ২৬
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৩৫০, পৃ. ৩৪
৫. তদেব, পৃ. ৮৯
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৩৯৩, পৃ. ১৬০
৭. গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পা.), বিচিত্রা পত্রিকা, পৌষ ১৩৩৪-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ. ৭৬৮
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ. ১২৭

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ. ১৬১
১০. তদেব, পৃ. ৪১
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আষাঢ় ১৩৪৯, পৃ. ২৬
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯, পৃ. ১৬৭
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ ১৩৫২, পৃ. ৬৮
১৪. তদেব, পৃ. ১০৮
১৫. তদেব, পৃ. ২৫
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ. ৮
১৭. তদেব, পৃ. ২৮
১৮. তদেব, পৃ. ৮২
১৯. তদেব, পৃ. ১২৩
২০. তদেব, পৃ. ১৭২
২১. তদেব, পৃ. ২৪১
২২. তদেব, পৃ. ২৫৩
২৩. তদেব, পৃ. ৩১২